ঘুমঘোরে

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের গল্প

শহরের প্রায় প্রতিটি বাঁক আমার চেনা, এই উঁচু-নীচু রাস্তা, রাস্তার ধার ঘেঁষে পাইনের সারি, বালকের চোখে দেখা সেইসব আমুদে দোকানপাট কেভেন্টার্স, গ্লেনারিজ, সাংরিলা, ছবির মতো সেইসব ছোটখাটো হোটেলবাড়ি, লজ, দূরের সেই পাহাড়শ্রেণী, রাস্তার গা বেয়ে উঠে যাওয়া, নেমে-যাওয়া সিঁড়ির অলিপথ, এমনকী, ঠিক এইখানে দাঁড়িয়ে নীচে চোখ চালিয়ে দেখা সেই ময়লা জলধরা ঘিঞ্জি বাজার। কিছুক্ষণ ধরেই পৃথা বলছিল, কই গো তোমার সেই নিত্যবাবুর বোর্ডিং হাউজ? পা যে আর চলে না। ছ-বছরের কন্যা মিশা বলল, বাবা, তুমি হোটেল খুঁজে পাচ্ছ না?

হঠাৎ করে আমার সংবিত ফিরে এসেছে মিশার কথায়। আমি সত্যিই ছেলেবেলার সেই বোর্ডিং হাউজটা খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ স্থির জানি সেটা এখানেই দাঁড়িয়েছিল। সামনে বে উইণ্ডো করা অ্যালা রঙের সাবেক চেহারার হোটেল। কলকাতার বাঙালিদের কাছে দার্জিলিংয়ের কালীবাড়ি। কেউ বলত ধর্মশালা। মালিক নিত্যবাবুর নামেই ডাকসাইটে। আসল নামটা-ক্যালকাটা

বোর্ডিং—কারও খেয়ালেই আসত না। বাবাকেও চিরকাল বলতে শুনেছি ‘নিত্যবাবুর ডেরা’।

কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে সেই ডেরার কোনো হদিশ পাচ্ছি না। বউকে যে গর্ব করে বলতাম আমার মাথাটা কম্পিউটার, যা ঢোকে তা চিরদিনের মতো গাঁথা হয়ে যায়, যে গর্বের গুড়ে এবার বালি ঝরছে। আমি ফের দেখলাম ‘সানি ভিলা হোটেল’-এর কাছে-ঘেরা লবিটার দিকে। ভেতর থেকে কে যেন বলল, ভেতরে ঢোকো। আমি হাতের স্যুটকেস জমিতে নামিয়ে তরতর করে হেঁটে গেলাম লবির ভেতর এবং বাঁকের সিঁড়ির প্রথম ধাপিতে পা রাখতে ডান পাশের কাচ দিয়ে দেখতে পেলাম সেই দৃশ্য, যা পুরো চব্বিশটা বছর সমানে যাতায়াত করছে। আমার স্মৃতির আয়নায়। আমি দেখলাম পিছনের সবুজ ঘাসের জমি দ্রুত গড়িয়ে নেমে গেছে। কয়েকশো ফুট আর তারপর কিছু শাল, পাইনের গাছে ঘেরা একটা শান্ত, ঘুমন্ত জমিতে উদাসভাবে দাঁড়িয়ে আছে একটা ভারিক্কি চেহারার, ছড়ানো-বিছানো সাহেবি ইমারত। ক্যালকাটা বোর্ডিংয়ের দোতলার বারান্দা থেকে বাবা ওই বাড়ির দিকে আঙুল তুলে বলতেন, ওই দেখো রাজভবন। গ্রীষ্মকালে ওখানে হরেন মুখুজ্জে, বিধান রায়রা এসে থাকেন।

হরেন মুখুজ্জে বা বিধান রায় যে কে বা কারা তার স্পষ্ট ধারণা ছিল না আমার, কিন্তু সেটা কবুল করলে বাবা চটে যাবেন, তাই বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলতাম, তাই বুঝি! মনে পড়ল এক সন্ধ্যায় জোনাকির মতো আলো জ্বলতে শুরু করেছে যখন সারা দার্জিলিংয়ে আর আকাশের একপাশে দেখা দিয়েছে আধখানা শুক্লপক্ষের চাঁদ, আমি হঠাৎ বারান্দায় মাকে ডেকে নিয়ে বললাম, দেখো ওইটা হল হরেন মুখুজ্জে, বিধান রায়দের বাড়ি। মা কিন্তু সত্যি অবাক হয়ে গিয়ে বলেছিল, তাই বুঝি!

আমি থমকে ছিলাম ওই ধাপিতেই। পিছন থেকে একটা তরুণ কন্ঠ শুনলাম, লুকিং ফর রুমজ, স্যার? আমি থতোমতো খেয়ে বললাম, আসলে আমি একটা চেনা হোটেল খুঁজছিলাম। কিন্তু পাচ্ছি না।

তরুণটি এবার বাংলায় জিজ্ঞেস করল, কোন হোটেল? বললাম, ক্যালকাটা বোর্ডিং। আর অমনি তরুণটি আমাকে রীতিমতো চমকে দিয়ে স্টাইলের ওপর বলল, আপনি সেই হোটেলেই দাঁড়িয়ে আছেন এই মুহূর্তে।

আমার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি, কোনো মতে জড়ানো গলায় বললাম, এটা সানি ভিলা নয়?

তরুণটি আশ্বস্ত করার টোনে উত্তর করল, অবশ্যই এটা সানি ভিলা, তবে বারো বছর আগেও এটা ছিল ক্যালকাটা বোর্ডিং। ইতস্তত করে বললাম, তার মানে নিত্যবাবু এটা বেচে দিয়েছেন? তরুণটি মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, না, তাঁর মৃত্যুর পর এটা এভাবে রেনোভেট করে নিয়েছি আমি।

—আপনি?

—ওঁর ছেলে। বিক্রম মজুমদার।

আমি কীরকম একটা আফশোসের ভঙ্গিতে সবে বলতে শুরু করেছি কিন্তু আগের হোটেলটা তো খারাপ ছিল না যখন মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিক্রম বলল, না। ওভাবে আর চালানো যাচ্ছিল না। যুগ পালটে গেছে। পিপল ওয়ন্ট কামফর্ট, নট নস্টালজিয়া। বাবা তো শেষ দিন অবধি কাপ-ডিশের চেহারাই বদলাতে দিলেন না।

আমার মনের ভেতর কয়েকটা সাবেকি কাপ-ডিশ ঝনঝন করে গড়িয়ে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আমার মুখ ফুটে শুধু কোনোক্রমে বেরিয়ে এল দুটো শব্দ—আই সি!

কিন্তু আমি বাইরের কিছুই আর দেখছি না, মনের মধ্যে একটা চব্বিশ বছরের পুরোনো ফিলম চালু হয়ে গেছে। গরম গরম লুচি আর আলু-টম্যাটোর তরকারি। সকালে বাবা-মা-র সঙ্গে গরম চা আর টোস্ট। রাতে রুটি-মাংস। ঘরে এসে পাথর বেচছে এক ফেরিওয়ালা। বাবা গরম জলে চান করতে করতে হাঁক দিচ্ছেন, সাহেব, মাকে তোয়ালে দিতে বলো! মা রাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে ভূতের গল্প শোনাচ্ছে। আর সকালে নিত্যবাবু এসে বাবাকে বলছেন, সাহেব, আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো এখানে? উত্তরে বাবা বলছেন, চাইলে তো আমি এভারেস্ট হোটেলেও উঠতে পারতাম। এই নিয়ে পনেরোবার এলাম এখানে, যতদিন বাঁচি আপনার এখানেই উঠব। নিন, এবার আপনি একটা খবরের কাগজের বন্দোবস্ত করুন।

বাবার আর আসা হয়নি এই হোটেলে বা দার্জিলিংয়ে। সে-বছর ডিসেম্বরেই দেহরক্ষা করলেন তিনি। আসা হয়নি আমারও, কারণ বাবা থাকবেন না, মা থাকবে না, অথচ আমি দার্জিলিংয়ে থাকব এটা মেনে নিতে চাইত না মন। কিন্তু এবার আর স্তোক দিতে পারা গেল না মিশাকে। হঠাৎ একদিন জিজ্ঞেস করে বসল, বাবা, সবচেয়ে সুন্দর পাহাড় কোথায়? মাস্টারি চালে বললাম, দার্জিলিংয়ে। তখন শিশুর মতো সরলভাবে জিজ্ঞেস করল, সেখানে কি আমি গেছি? বললাম, না।

-তুমি?

—হ্যাঁ।

—আমি আর মা যাব না?

শুনলাম বিক্রম জিজ্ঞেস করছে, তা হলে কি থাকা হচ্ছে এখানে?

আমি এক গভীর ঘুম থেকে ধড়মড়িয়ে উঠে বললাম, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! আমার মেয়ে-বউ মালপত্তর নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের ডেকে আনি।

বলেই বেরিয়ে আসছিলাম। বিক্রম বলল, কীরকম ঘর পছন্দ স্যারের? হেঁটে যেতে যেতেই জানিয়ে দিলাম, দোতলার পিছনের বড়ো বারান্দা দেওয়া ঘরটা। বিক্রম বলল, পিছনের ঘরটা আপনি পাবেন, তবে বারান্দাটা নেই।

আমি ঘরটার সঙ্গে স্মৃতির ঘরটা মেলাতে পারছিলাম না কিছুতেই। আলমারিতে কাপড় ঝোলাতে ঝোলাতে পৃথা বলল, তোমার সেই বোর্ডিং মনে হচ্ছে খুঁজে পাচ্ছ না এখানে?

আমি বললাম, কী করে পাব, এটা তো হোটেল। সেটা ছিল কীরকম বাড়ি বাড়ি মতন। সিঁড়ি দিয়ে ব্যোমবাহাদুরের পিঠে চড়ে নামতাম। রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে মটরশুটি খাওয়াত। এইসব বেয়ারা স্রেফ চাকরি করে।

মিশা আমার কথা শুনে লাফিয়ে উঠল—আমি তোমার পিঠে চড়ে নামব সিঁড়ি দিয়ে বাবা! কিন্তু আমি সাহস পেলাম না। সরু সিঁড়ি দিয়ে যদি পা হড়কে পড়ি। ব্যোমবাহাদুর আমাকে ওভাবে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করলে মা খুব ভয় পেত, কিন্তু বাবা বলতেন, কিসসু ভেব না! এরা পাহাড়ি লোক, পাহাড় বেয়ে ওঠে-নামে। তোমার ছেলে বেশ থাকবে ওর সঙ্গে।

আমি মিশাকে রাজভবন দেখাব বলে কোলে করে জানালায় নিয়ে গেলাম। দেখি সেই দৃশ্য ঠিক তেমনই আছে, সেই শান্ত, নীরব রৌদ্রলোকে ঝলমলে,

একটেরে। মিশা বলল, ওটা কী বাবা? আমি বললাম, ওখানে গ্রীষ্মকালে জ্যোতিবাবুরা থাকেন। ওটা রাজভবন। মেয়ে বলল, কলকাতায় যখন খুব গরম পড়ে আর লোডশেডিং হয় তখন? বললাম, অন্য সময়েও থাকেন, যখন কাজ হয়। মেয়ে বলল, তুমি ওখানে গেছ বাবা? বললাম, না যাইনি। তোমার ঠাকুরদা আমাকে এইখান থেকে দেখিয়েছিলেন। মেয়ে বেশ রোমাঞ্চিত হয়ে বলল, এইখান থেকে আর কী দেখিয়েছিলেন ঠাকুরদা? আমি বললাম, আকাশের অনেকগুলো তারা, যাদের বলে সপ্তর্ষিমন্ডল। আর ওইদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘার পিক। এখন তো সেই বারান্দা নেই তাই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে না। আমি অন্য জায়গা থেকে সেটা তোমার দেখাব।

বলতে বলতে চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকল বেয়ারা, পিছন পিছন বিক্রম। আর ঢুকেই সরবে প্রশ্ন করল, কী স্যার, কেমন বুঝছেন সানি ভিলা? সব দিক থেকেই আগের চেয়ে কত মডার্ন, কত এলিগ্যান্ট? কিন্তু বাবা বুঝতে চাইতেন না।

আমি বিক্রমকে একটা চেয়ার টেনে বসতে বললাম। পৃথা ওকেও এক কাপ চা দিল। ছোকরা তো হাঁ! হাঁ! করে উঠল।

-বলেন কী স্যার? আমার হোটেলে বসে আমাকে এন্টারটেন করছেন। ওটি হচ্ছে না।

আমি বললাম, আপনার বাবা কিন্তু আমার বাবার সঙ্গে বসে সকালের চা-টা খেতেন।

বিক্রম বলল, সে কি! আপনারা এতদূর ঘনিষ্ঠ আমাদের সঙ্গে? ইন দ্যাট কেস এই চায়ের বিলটা আপনার বিলে জুড়ছি না। ইটস ফ্রম মাই সাইড। যাকে বলে অন্য দ্য হাউস।

ছোকরার খুব প্রাণস্ফুর্তি আছে দেখছি, ডজনে যোলোটা করে কথা ফোটে। ওকে আমার ভালো লাগছে, আবার নিত্যবাবুর মতো আপনার জন মনে হচ্ছে না। আমি একটু মৌতাত। করে চা খেতে খেতে উদাস হয়ে পড়ছি দেখে ও ওর এই হোটেল বিষয়ে প্রোপাগাণ্ডা শুরু করল পৃথার কাছে। কখন যেন শুনলাম বলছে, আপনার স্বামী লেখক। ওঁর পক্ষে আইডিয়াল লেখার জায়গা আমার এই হোটেল। বাগানে নেমে দেখবেন কীরকম ফুলের বাহার। ওসব আমার নিজের হাতে কালচার করা।

পৃথা বলল, রাতে ঘর গরম করার কী ব্যবস্থা?

-কেন, রুম হিটার লাগিয়ে দেব। বাবা তো কিছুতেই ফায়ারপ্লেস বদলে ইলেকট্রিক করতে দেননি।

—আমার কর্তার কিন্তু ফায়ারপ্লেসের ওপরই দুর্বলতা।

—হবেই তো! লেখক না? ওঁরা চেঞ্চকে রেজিষ্ট করেন। কিন্তু ফায়ারপ্লেসের ধকল সামলাতে বাবা তো হিমশিম খাচ্ছিলেন। কে অত কাঠকয়লা জোগাড় করবে? সে ছিল এক ব্যোমবাহাদুর, ওই সব নিয়েই থাকত। আজকাল...

বিক্রমকে কথার মধ্যে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সেই ব্যোমবাহাদুর কি নেই এখন?

—তা বছর আষ্টেক হল। শেষ দিকে খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল। কিছুতেই মন ভরে না, সারাক্ষণ হম্বিতম্বি। তারপর তো বউ মরতে মাথাই খারাপ হয়ে গেল।

.

-মাথা খারাপ হয়ে গেল! ব্যোমবাহাদুরের!

–ওই আর কি! একা হয়ে গিয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলে ঘুম স্টেশনে গিয়ে বসে থাকত।

–কেন, ওর ছেলেপুলে ছিল না?

—কোথায়? ওর বউয়ের তো একটার পর একটা মিসক্যারেজই হল চিরকাল। সবাই বলত, ফের সাদি করা। কিন্তু কে শোনে কার কথা। বোর্ডিংয়ে যত ছেলেপুলে আসত তাদেরই বানিয়ে ফেলতে নিজের বাচ্চা। তারপর একবার একটা বাচ্চাকে লোফালুফি করতে করতে ব্যালান্স হারিয়ে ফেলল। সে-বাচ্চা পড়ে গিয়ে পায়ে বেদম চোট পেল। তখন আবার বাবা নেই, আমি সবে কাজ দেখছি। কাস্টমার আমাকে এই মারে তো সেই মারে। শেষে ক্ষমা চেয়ে, বিল থেকে দুশো টাকা মাইনাস করে রেহাই। তারপর আই লস্ট মাই টেম্পার। ভুলে গেছি কী না কী বলেছিলাম ব্যোমবাহাদুরকে। অ্যাণ্ড মাই ফুট! হি সিম্পলি ওয়াকড আউট দ্য হোটেল অ্যাণ্ড নেভার কেম ব্যাক!

আমি সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করলাম, ডু ইউ মিস হিম?

বিক্রম আজকালকার পরিচিত স্টাইলে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, নট রিয়েলি! ও একটা অন্য সময়ের লোক। খুব ভালো ছিল ও নিজের সময়ে। তবে এখন অচল। মোরওভার হি ওয়জ কোয়াইট ওল্ড। চোখেও ভালো দেখত না।

আমি হতাশ হয়ে বললাম, ওল্ড? ব্যোমবাহাদুর? তারপর নিজের মনে মনে বললাম, বাট আই মিস হিম!

বিকেলে ম্যালে গিয়ে ঘোড়ায় চড়াচ্ছিলাম মিশাকে। আর এক কোণে দাঁড়িয়ে পৃথাকে দেখাচ্ছিলাম আশপাশের লোকালয়। হর্সরাইড শেষ করে মিশা ছুটে এসে বায়না ধরল, বাবা কাল টয় ট্রেন চড়াবে? বললাম, নিশ্চয়ই। তার আগে আজকে এখানে দাঁড়িয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখো। ও বলল, সেটা কোথায়? আর আমিও দেখলাম, তাই তো! একটা বিরাট মেঘ এসে আকাশের একটা দিক অন্ধকার করে ফেলেছে। মেঘের থেকে ঠিকরে কিছুটা রোদের ছটা বেরুচ্ছে, কিন্তু হঠাৎ করে কীরকম সন্ধ্যে সন্ধ্যে ভাব চারদিকে।

আমার মনে পড়ল বাবা আর মা-র সঙ্গে ম্যালের সেই সন্ধ্যে। আমি মিশার চেয়ে আরেকটু বড়ো তখন। হঠাৎ বাবা বললেন, একটা কবিতা শোনাও তো সাহেব! আমি লজ্জা পাচ্ছিলাম। বাবা বললেন, তা হলে আমার কবিতাটি শোনো। এ কবিতার নাম কালী দ্য মাদার'। লিখেছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

বাবা যে কী বলছে গম্ভীর কণ্ঠে আমি তার কিছুই বুঝছি না। শুধু দেখছি মা কীরকম হাঁ হয়ে শুনছে। যেভাবে মা কখনো আমার কথা শোনে না। আমার খুব হিংসে হচ্ছে বাবার প্রতি। পৃথাকে বললাম, জানো তো, বাবা এখানে দাঁড়িয়ে কী কবিতা শুনিয়েছিলেন আমাদের? পৃথা বলল, না তো! আমি আর ভণিতা না বাড়িয়ে আবৃত্তি করতে লাগলাম

দ্যা স্টারস আর ব্লটেড আউট,
দ্য ক্লাউডস আর কাভারিং ক্লাউডস,
ইট ইজ ডার্কনেস ভাইব্রান্ট, সোন্যান্ট,
ইন দ্যা রোরিং, হোয়ার্লিং উইণ্ড...

আবৃত্তি শেষ হতে দেখি পৃথা মা-এর মতো সেই অবাক নেত্রে আমাকে দেখছে, হাঁ হয়ে দেখছে আমাকে মিশা। আর ওদের দুজনের মুখের উপর কমলা রঙের রোদ এসে পড়েছে। স্বামীজির কবিতা বলতে বলতে, মনে মনে বাবা সাজতে সাজতে খেয়ালই করিনি কখন যে মেঘ সরে আকাশ, পাহাড়, প্রকৃতি ফের ঝলমলিয়ে উঠেছে। একটা নেশাও চেপেছে মিশা আর পৃথাকে একটা নতুন কিছু দেখানোর। অথচ মনে কোথায় যেন একটা ব্যথা ব্যথা ভাব। বললাম, চলো, তোমাদের ঘুম দেখিয়ে আনি। সে দার্জিলিংয়ের থেকেও উঁচুতে। একটু ঘুমিয়ে থাকার জায়গা।

একটা ট্যাক্সি করে ঘুম স্টেশনে এসে পড়েছি। সেটা যে কীসের টানে তা এতক্ষণে খেয়ালে এল। আমার ভীষণ দরকার পড়েছে ব্যোমবাহাদুরকে। সে নাকি এই ঘুম স্টেশনেই বসে থাকে। ওকে পেলে ওর কোলে আমি মিশাকে ছুড়ে দেব। চাপিয়ে দেব পিঠে, বলব, যত পারো লোফালুফি করো। ও তোমার বাচ্চা।

কিন্তু মেঘে-জড়ানো ঘুম স্টেশন ঘুমিয়েই আছে। আর আমি পৃথা আর মিশাকে নিয়ে খুঁজছি। একটা স্মৃতির মানুষকে, যাকে প্রথম এবং শেষ দেখেছি চব্বিশ বছর আগে। কিন্তু জায়গা শুনশান, জনমানবহীন। আমি বউ, মেয়ে নিয়ে বসে পড়লাম স্টেশনের বেঞ্চিতে। মিশাকে বললাম, এখন আমরা ট্রেন দেখব। বলে পকেট হাতড়ে সিগারেট বার করে ধরালাম।

আর ঠিক তখনই পিছন থেকে একটা ভারী, কেশো, বৃদ্ধ গলায়–বাবু, একটো সিকরেট হবে? মাথা ঘুরিয়ে দেখি এক বৃদ্ধ নেপালি, জীর্ণ কোট আর কম্বলে জড়ানো, চোখে মোটা কাচের চশমা, কোনো মতে ডান তালুটা বার করে রেখেছে সিগারেটের আশায়। আমি একটা সিগারেট বার করে দিতে গিয়ে দেখলাম যে দুনিয়ার সমস্ত দুঃখ, করুণা নিয়ে তাকিয়ে আছে আমার মেয়ের মুখের দিকে।

মোটা চশমার ওপারে ওর চোখের বিশেষ কিছুই আমি দেখতে পাচ্ছি না। শুধু মনে হচ্ছে ওর চাহনির মধ্যে একটা ব্যোমবাহাদুর ছেয়ে আছে। ওই ঘাড় হেলানো চাহনি আর মৃদু হাসি। আমি চট করে গোটা প্যাকেটটাই তুলে দিলাম ওর হাতে। বৃদ্ধ বলল, আগ, বাবু। আমি দেশলাই দিলাম। দিয়ে বললাম, তুমি ব্যোমবাহাদুর? বৃদ্ধ হ্যাঁ, 'না' কিছুই বলল না। আমি মিশাকে ডেকে ওর সামনে এনে বললাম, আমার মেয়ে।

বৃদ্ধ সেই সমানভাবে ঘাড় হেলিয়ে দেখে যাচ্ছে মিশাকে। কিন্তু স্পর্শ করছে না। এ কি সেই হাত থেকে বাচ্চা ফসকানোর ফল? কিন্তু ও মিশাকে কোলে না নিলে আমি জানব কী করে যে ও-ই ব্যোমবাহাদুর? যে বাচ্চা লোফে না সে কি ব্যোমবাহাদুর হয়? এদিকে বাল্যের স্মৃতিও বড়ো ঝাপসা, জটিল হয়ে উঠছে। ভাবছি ব্যোমবাহাদুরের হাইট কত ছিল? সে কি সত্যি সত্যি ঘাড় হেলিয়ে আমাকে দেখত? সে কি সিগারেট খেত? সে কি সিগারেট ধরাতে গিয়ে বার বার কাঠি নিভিয়ে ফেলত? সে কি নাম জিজ্ঞেস করলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত বৃদ্ধের মতো?

আমি ফের জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ব্যোমবাহাদুর? লোকটা দেশলাইটা ফেরত দিয়ে পিছন ঘুরে গুটগুট করে হাঁটতে লাগল অন্যদিকে। এবং একটু পরে হারিয়ে গেল মেঘের আড়ালে।